গণশক্তি

আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

শুধু ব্যক্তিমানুষের প্রতি নন, বিদ্যাসাগর দায়বদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতি। সেই মনুষ্যত্ব তাঁকে টেনে নিয়ে যায় দুঃখের সেই অপার সাগরের তীরে, যেখানে তাঁর হৃদয়ের ক্রন্দন থেকে উঠে আসা কর্মের তাগিদ।

প্রতীকে, প্রকৃতে বিদ্যাসাগর আক্রান্ত

কুমার রানা

কখনো কখনো প্রতীক হয়ে ওঠে প্রকৃতের থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এবং অর্থবহ, যেমনটা হলো ১৪ মে। মানব বিদ্বেষের হেঁটে-চলে বেড়ানো প্রতীক অমিত শাহের নির্বাচনী শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়া সশস্ত্র একদল লোক তথাকথিত প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে পড়ল আর স্নায়ু-সঙ্ঘর্ষের আবহে বিদ্যাসাগরের মূর্তিটা ভেঙে গেল, অথবা প্ররোচকরা নিজেরাই এটা করে বি জে পি'র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিল - এ ব্যাখ্যাটা যতই বাস্তব হোক এর মর্মবস্তু এত সরল নয়। প্ররোচনা থাক বা নাই থাক, প্রকৃতপক্ষে মূর্তি যে-ই ভেঙে থাকুক, বিদ্যাসাগর যে বি জে পি'র আক্রমণের লক্ষ্য এতে সন্দেহ থাকার কারণ নেই। যদি প্ররোচকরা ভেঙে থাকে, বাজি ধরে বলা যায়, অনতিবিলম্বে তারা শিবির বদলাবে।

বস্তুত, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে- প্রকাশ্য বা অ-প্রকাশ্য - আক্রমণটা বি জে পি'র পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, এটা তাদের রাজনীতির অংশবিশেষ। যে রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে অ-জ্ঞান। মানব সভ্যতার পূর্বশর্ত বিমুক্ত চিন্তা। তার সঙ্গে যে রাজনীতির সম্পর্ক স্বভাবজ শত্রুতার সে রাজনীতির পক্ষে বিদ্যাসাগরকে সহ্য করা অসম্ভব, কারণ বিদ্যাসাগর তাদের কাছে মানুষমাত্র নন, জ্ঞানের প্রতীক, যে জ্ঞান মানুষকে তার পাশব প্রবৃত্তিগুলো থেকে, তার নির্বুদ্ধি ও অ-হিতৈষণা থেকে মুক্ত করে। এমন এক প্রতীক থাকতে অ-জ্ঞানের পূজা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য।

অনেকে এটাকে বাঙালিদের ওপর, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণ বলে নিন্দা করছেন। আমার মনে হয়, এই মূল্যায়নে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের কালে, এবং আজ তাঁর জন্মের ২০০ বছর পরেও, আদ্যন্ত বিশ্বমানব। তাঁর বাঙালি হিসেবে নিজস্ব গৌরব অবশ্যই ছিল; কিন্তু তিনি কখনোই সে গৌরবকে তাঁর বিশ্বাশ্রয়ী চিন্তার ওপর চেপে বসতে দেননি। বাস্তব অবস্থার কারণে মানুষকে তার কর্মকাণ্ডের পরিধি একটা ভূগোলের মধ্যে সীমিত রাখতে হয়, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু জ্ঞানকে ভূগোলের মধ্যে আটকে রাখলে তা আর জ্ঞান থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় আত্মসর্বস্ব মানব-দ্রোহ। বি জে পি'র তথাকথিত ভারতপ্রেম, ভারতীয় অহমিকা, যা আসলে সমাজের চিরাচরিত ক্ষমতা বজায় রাখার ব্যবস্থামাত্র, তার প্রতি যে বিদ্যাসাগর কিছুতেই সদয় হতে পারেন না, বরং নির্দয় আঘাতে তাদের এই অন্ধকারকে ভাঙতে চান, তারা সেটা জানে। জ্ঞান তাঁর অভীষ্ট, সে জ্ঞানকে তিনি সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছেন, এবং এটা করতে গিয়ে তিনি ব্যবস্থা করছেন ছাত্ররা যাতে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হয়, কেবল তথাকথিত হিন্দু-দর্শনের গর্বে নিজেদের আচ্ছন্ন না রাখে। তাই সজোরে ঘোষণা করছেন, " সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল…সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে।"

যে মানুষটি মতবাদের ভিন্নতা ও চিন্তার বৈচিত্রকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন, জোর দিয়ে বলছেন সংস্কৃত পড়াতে গেলে ইংরেজি শিখতে হবে, শিশুদের জন্য লেখা পাঠ্যবইয়ের জন্য একদিকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করছেন ভারতীয় মহাকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যকৃতিগুলো থেকে তেমনি আবার তুলে আনছেন বিশ্বের অঙ্গন থেকে নানা আখ্যান, সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্রচর্চার পাশাপাশি বিপুল পরিশ্রমে লিপিবদ্ধ করে চলেছেন বাংলায় কথ্য শব্দমঞ্জরী, তাঁকে সহ্য করা বি জে পি'র মতো ঘোর অন্ধকারবাদী, এবং ভারতকে বিশ্বের জ্ঞান সমুদ্রের বাইরে এক বিচ্ছিন্ন মাতা নামক এক কাল্পনিক এক দলের পক্ষে অসম্ভব। বহুত্বের শক্তির প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে কঠিন পরিশ্রমে বাংলার মানুষের কথ্য শব্দগুলোকে সংকলিত করতে, কারণ, তিনি জানতেন ভাষাকে বিকশিত হতে হলে, সমাজকে সমৃদ্ধ হতে গেলে রস সংগ্রহ করতে হবে ঘরে-বাইরে সর্বত্র বিস্তৃত ভূমি থেকে। আবার এই সংগ্রহের প্রক্রিয়াতেও আছে বহুত্বের প্রতি বিশেষ প্রবণতা, "বোধোদয়"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ঋণস্বীকার যার অনেকের মধ্যে একটা অভিজ্ঞান: "ত্রিপুরা জিলার… শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মহাশয়" এবং " কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়" কিছু অসংলগ্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার " অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিলে, ঐ সকল স্থল পূর্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত।" শুধু চিন্তা ও প্রক্রিয়ার প্রশ্নে বহুত্বের ওপর জোর দেওয়ার ব্যাপারেই নয়, বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে আরও অনেক অসাধারণত্বের সম্মিলন যা যে কোনও পশ্চাদমুখী রাজনীতির কাছে বিপজ্জনক। সমাজে নারীদের অবস্থান নিয়ে তাঁর উপলব্ধি, "প্রভুতাপন্ন পুরুষজাতি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর প্রায় সর্বপ্রদেশে স্ত্রীজাতির ইদৃশ অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয়না।" যে দলের প্রধান সমর্থনভিত্তি সেই সব অজ্ঞতাবন্দি লোকেরা যারা কন্যাসন্তানদের জন্মানোর আগেই, বা "ভুল করে" জন্ম নিয়ে ফেলার অব্যবহিত পরেই, খুন করে, যারা সতীপ্রথার সমর্থক, মেয়েদের বাইরে বেরোতে দিতে যাদের ঘোর আপত্তি, নারী ধর্ষিতা হলে যারা আক্রান্তার পোশাককে দোষী ঠাওরায়, তাদের কাছে বিদ্যাসাগরের চেয়ে মহাশত্রু আর কেই বা হতে পারে।

শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর চাইছেন মানুষে মানুষে উচ্চাবচ দূর করতে, ধর্ম বলতে তিনি বুঝছেন না সাধন-পূজন-আরাধনা, বুঝছেন দয়া, পরহিতৈষণা, অহিংসা, শ্রমলব্ধ উৎপাদনে শ্রমিকের অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সকল মানুষের অধিকারকে। ধর্মকে ক্ষুদ্র কোটরে আটকে রেখে যারা রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে চায়, বিদ্যাসাগর তাদের কাছে মূর্তিমান দুঃসংবাদ। তাঁর বোধের শেকড় মানুষের বুদ্ধির অনুশীলনে। কিন্তু সে বুদ্ধি, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে, "সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়।" এমন বুদ্ধির কর্মী যে দুর্বুদ্ধির কারবারিদের চক্ষুশূল হবেনই তাতে আশ্চর্য কি! শুধু ব্যক্তিমানুষের প্রতি নন, বিদ্যাসাগর দায়বদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতি। সেই মনুষ্যত্ব তাঁকে টেনে নিয়ে যায় দুঃখের সেই অপার সাগরের তীরে, যেখানে তাঁর হৃদয়ের ক্রন্দন থেকে উঠে আসা কর্মের তাগিদ। সে তাগিদ, রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে দেখেছেন, " রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।… তাঁহার সবল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন।" এই বেদনাবোধে বিদ্যাসাগর সবল, এবং সরল। সারল্যের এই দীপ্তির সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে বি জে পি'র সর্বধ্বংসী কুটিলতা। অতএব, বিদ্যাসাগরকে, প্রতীকে ও প্রকৃতে, আজ হোক বা কাল, তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হতেই হবে।

স্বীকার করতেই হবে, এ বড় কঠিন সময়। এ-সময়ে ভুবনের কাছ থেকেই আমরা শিখতে পারি কর্তব্যের বর্ণপরিচয়: যখন যা কর্তব্য তখনই তা করতে হয়। সে কর্তব্য হলো, যাবতীয় ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দিয়ে, তাৎক্ষণিক কলহগুলোকে নিবৃত্ত রেখে অন্ধকারের উপাসক ও বিশ্বমানবতার নিপীড়ক বি জে পি'র দৌরাত্ম্য ও তাণ্ডবকে প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার প্রধান সম্বল তার জ্ঞান ও জ্ঞানের অনুসন্ধানটাই আজ বিপন্ন। সেই ভয়াবহতা থেকে মুক্তির লড়াইটাতে অবিমৃশ্যকারী হওয়ার বিলাসিতা কোনও সুস্থবুদ্ধির লোকই দেখাতে পারেন না, মানবতার সর্বোচ্চ বিকাশের পথে সর্বাগ্রগামী বামপন্থীরা তো আদৌ পারেন না।